Lotus Buds

বাংলা

পাঠকগণ,

আমাদের চারপাশ যখন গর্জে উঠেছে বিচারের দাবিতে তখন সেই সমাজের অংশ হয়ে আমরা নিশ্চুপ থাকতে পারি না। যে অন্যায় হয়েছে তা ঘৃণ্য এবং আশা করবো যে শীঘ্রই এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হয়। এ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটা মানুষ যেন নিরাপদভাবে এবং শান্তিতে নিজের জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। এই মর্মে এবারের সংখ্যার ভূমিকা এবং উপসংহারে রইল আমাদের প্রতিবাদের ভাষা।

-ইতি,

লোটাস বাড (ডিজিটাল), বাংলা শাখা

উমা

শ্রেয়সী মল্লিক, শ্রেণি: ১২ বিভাগ- ‘গ’

ছোট্ট উমার স্বপ্ন ছিল বড়,
সে হবে নাকি ডাক্তার,
গলায় ঝুলিয়ে স্টেথোস্কোপ দেখবে
নাকি রুগী,
ইচ্ছেটাকে পূরণ করতে ফাঁক
রাখেনি আর।

উমা সেদিন পেয়েছিল চান্স
ডাক্তারিতে ,
মা ছিলেন রান্নাঘরে ,
তিনি আঁচলেতে মুছলেন অশ্রুজল,
আর বাবা বললেন, “আয় মা,
তোকে বুকে রাখি ধরে।“

উমা হলো বড় ডাক্তার,
পেলো ভালো চাকরি ,
রোগী দেখতে দেখতে সারাটা দিন
কাটত তার,
বিশ্রাম নেওয়া ছিল মুশকিল ভারী।

সেদিন রাতে কিছু হিংস্র প্রাণী,
কেড়ে নিলো উমার প্রাণ,
রক্তাত্ব দেহটাকে পাওয়া গেলো
হাসপাতালে ,
বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি , ন্যায়
বিচারের গান।

হাজার হাজার উমা জড়ো হলো
একসাথে ,
পেতে চায় তারা নারীদের নিরাপত্তা,
জানালো তারা জঘন্য অপরাধের
ধিক্কার,
মেয়েদের ওপর অত্যাচার করাটাই
কি দেশের স্বাধীনতা?

এক উমা করে অফিসে চাকরি ,
আরেক করে বাড়ি বাড়ি কাজ,
আরেক উমা পড়ছে ইস্কুলেতে ,
আরেক উমা করছে দেশের, দশের
কাজ।

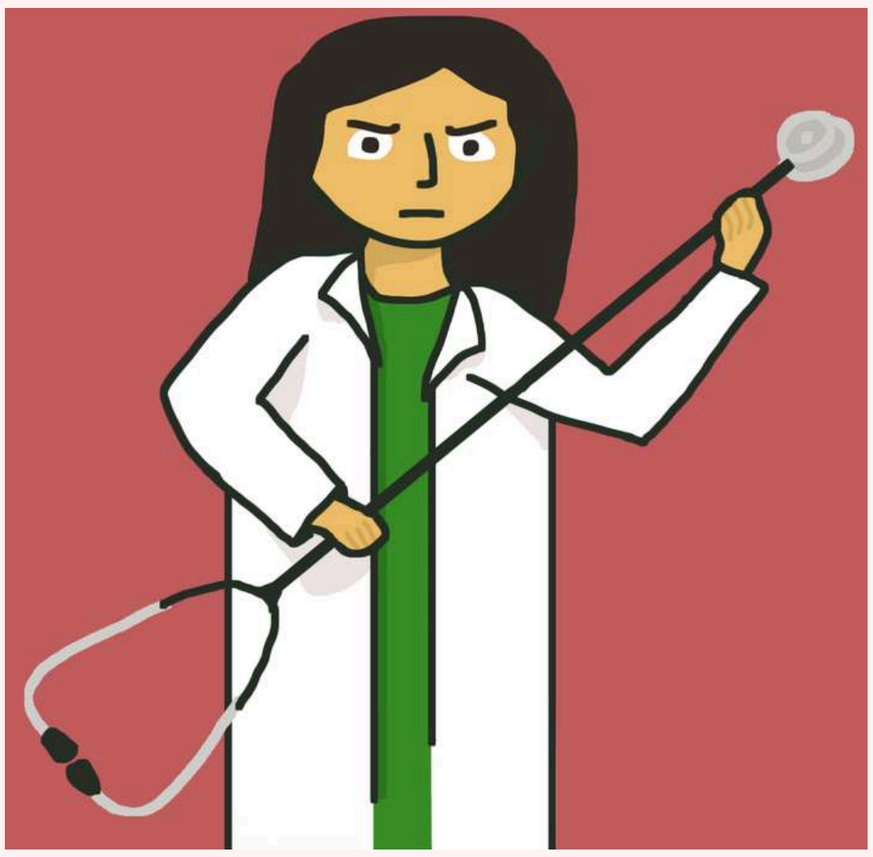

তাদের মনে আশঙ্কা,
ওদের সাথে ও যদি এরকম
অপরাধ হয়?
"কোথায় যাবো?" "কাকে বলব?"
করছে তাদের ভয়।

ভয় কে জয় করতেই হবে ,
মানা যাবে না হার,
মা দুগ্গাও অসুর বধ করেছিলেন,
আমাদের উমাও করবে লড়াই, জিততে
হবে এবার!

ডানা মেলে উড়বে উমা,
এক স্বাধীন, মুক্ত আকাশে ,
পাবে তারা অন্যায়ের প্রতিকার,
ছোট্ট উমা ছুটে বেড়াবে দিগন্তের ঘাসে
ঘাসে ।

এডিটর: দেবপর্ণা ঘোষ(১০-ক)

আমাদের এবারের সংখ্যার বিষয় ছিল বন্ধুত্ব। হাতে হাত রাখা, বেঁধে বেঁধে থাকা.....

বন্ধুত্ব

ভার্গবী দাস । ষষ্ঠ শ্রেণী, ঘ বিভাগ।

আমাদের পাড়ার একদম শেষের বড় বাড়িটি তপন জেঠুর। তিনি দীর্ঘদিন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ওনার স্ত্রী, মীরা জেঠিমা বেশ রাগী। সকলেই সমীহ করে চলে। ওনাদের একমাত্র ছেলে রজত, বরাবরই পড়াশোনায় খুব ভালো। আমরা ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় রজতদার ভালো রেজাল্ট করার গল্প শুনে বড় হয়েছি। সেই রজতদা গত বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে খুব ভালো চাকরি পেয়ে মুম্বাই চলে গেল।

তারপর থেকেই তপন জেঠু আর মীরা জেঠিমা কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁরা খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরোতেন না, লোকজনের সাথে খুব বেশী কথাও বলতেন না। মনে হচ্ছিল যেন রজত দা যাওয়ার সাথে সাথে তপন জেঠু আর মীরা জেঠিমার জীবন থেকে হাসি ঠাট্টার,

মজা করার এবং জীবন কে উপভোগ করার সব ইচ্ছেও চলে গেল; মুরছে পড়লো দুজনে।

কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গেল জেঠিমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের পাড়ার দিবাকর ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখলেন যে জেঠিমা খুব অসুস্থ। ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার অনেক বেশীর দিকে ছিল। ডাক্তারবাবু বললেন রোজ বিকেলে হাঁটতে হবে নাহলে শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে এবং বাড়িতে থাকার ফলে মানসিক অসুবিধেও দেখা দিতে বারে। কিন্তু ওঁরা বেরোতেই চাইতেন না । খবর পেয়ে রজত দা বেশ কিছু দিনের জন্য ফিরে এল। সেদিন বিকেলবেলা আমরা যখন পার্কে খেলছিলাম, রজত দা এসে বলল, “ তোদের হাতেই আমি মা বাবার দায়িত্ব দিতে চাই, কারণ বড়রা তো সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকে,

ওদের সময় হবে না। তোরা পারবি না বিকেলবেলা মা বাবাকে একটু বাইরে বের করতে?“ আমরা সবাই মিলে বললাম, ” নিশ্চয়ই পারব।“

প্রথমদিকে জেঠু জেঠিমা আসতে চাইতেন না। আমাদের বকাবকিও করতেন কিন্তু কিছুদিন পর অনেক জোড়া জুড়ি করায় ওঁরা পার্কে আসা শুরু করলেন।

আমাদের খেলা দেখতেন এবং একটু হাঁটাহাঁটি করতেন। আমরাও পালা করে ওঁদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম আর পৌঁছে দিয়ে আসতাম। আস্তে আস্তে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হলো। জেঠু নিজের ছোটবেলায় সেই মাঠে খেলার কত গল্পই না করতেন আমাদের সাথে, জেঠিমা আমাদের সাথে রজতদার ছোটো বেলার দুষ্টুমির গল্প করতেন। আমাদের ফুটবল খেলার অনেক কেত ও শিখিয়ে দিয়েছিলেন তপন জেঠু।

আজ রবিবার। পাড়ার ছোট্ট মেয়ে তুয়ার জন্মদিন, সন্ধ্যাবেলা সকলের নিমন্ত্রণ। ঠিক সাতটার সময় যখন কেক কাটা হবে হঠাৎ দেখা গেল রঙিন জন্মদিনের টুপি পরে তপনজেঠু আর মীরাজেঠিমা হাজির। আমাদের অবাক করে দিয়ে ওঁরা বললেন “ এখন থেকে আমরা তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সাথে ঘুরবো, খেলবো আর দুর্গাপুজোর সময় একসাথে মজা করে ঠাকুর দেখবো।“

এডিটর: অস্মিতা বোস(৯- গ) এবং
জয়স্মিতা বোস (৯- ক)

হারিয়ে পাওয়া

-শিবরঞ্জনী মিত্র।(ক্লাস-৬-ঘ)

জানালার বাইরে সিকিম পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে, সমুরা গাড়িতে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে লা-চুং এর দিকে, মা, বাবা আর সমু এবারে পুজোর ছুটি কাটাতে এসেছে সিকিমে। বাবা খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন ড্রাইভের কাকুর ওপর, ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছিল হোটেল পৌছতে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ! সমুর চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে এল, সমু গড়িয়ে পড়ছে নিচে, সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা। ব্যাস! তার পর আর কিছু মনে নেই।

ঘুমটা ভেঙে গেল সমুর। পঞ্চা কাকা খুব জোরে চেচাচ্ছে, বিলু, রাজু, কমল সবাই উঠে পড়েছে। ওদের বেরতে হবে আজকের পসরা নিয়ে। সকাল সকাল না বেরলে বিক্রী-বাটা জমবে না। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সমু তৈরি হয়ে নিচ্ছিল আর তিন জনের মতো। কিছু খেয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে হরেক রকম মাল বিক্রী করতে। ওরা সবাই হাথে-ঠেলা গাড়িতে প্লাস্টিক এর জিনিসপত্রের পসরা নিয়ে বিক্রী করে সোনারপুরের বিভিন্ন এলাকায়। সমুকে কমল পেছন থেকে ডাকল “এই কাঞ্চা! আমার সাথে আয়। আজ যাবো রায়-পাড়া, ওখানে বিক্রী ভাল হয়”। ওরা রোজকার মতো বেরিয়ে পড়ল।

সমুকে এখন সবাই কাঞ্চা বলে ডাকে। ওকে নাকি পঞ্চা কাকা জলপাইগুড়ির এক হোম থেকে নিয়ে এসেছিল । সমু এখন মনে করতে পারে না ওর ডাক নাম, ওর ভাল নাম ‘সৌমেন সেন’,

ওর বাবা মাকে , ও কোথায় থাকতো .. সব ওর কাছে জমাট অন্ধকার । ছেলেটাকে পঞ্চা কাকা জলপাইগুড়ির বাস রাস্তায় একা বসে থাকতে দেখে সঙ্গে করে নিয়ে আসে এই সোনারপুরে , কালী মল্লিক লেনের এই ঘুপচি বাড়িতে।

আজ বাইশে অক্টোবর , ড্রইং রুম এর সোফায় রমলা বসে কাঁদছে । আজকের দিনটা রমলার কাছে এক বিভীষিকা । ঠিক এক বছর আগে, এই দিনে, ঘটে গিয়েছিল সেই ভয়ানক ঘটনা । সমুকে হারিয়ে ফেলেছিল ওরা , লা-চুং এর রাস্তায় সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় । প্রায় মরেই যেত রামলা ও সমীরণ , কোনমতে বেঁচেছিল ওরা কিন্তু চিরতরে হারাতে হল আঠ বছরের সমুকে । সমু বেঁচে আছে না নেই রমলা জানে না । তবে আজকের এই দিনটা ওর কাছে ভীষণ যন্ত্রণার, অনুশোচনার ।

রায়পাড়ার রাস্তায় আজ কাঞ্চা আর কমল ঘুরছিল । আজ তেমন বিক্রী হয়নি । পঞ্চা কাকার কাছে খুব বকা খেতে হবে । কমল কাঞ্চাকে বলল “ আচ্ছা ! কোলকাতায় যাবি ? ওখানে শুনেছি খুব বিক্রী ভাল হয় ”। কাঞ্চা বলল “ পঞ্চা কাকা রাজি হবে ?”

কমল বলল “ খুব রাজি হবে , পয়সা এনে দিলে পঞ্চা কাকা আমাদের লন্ডনেও যেতে দেবে” । দুজনে খুব জোরে হেঁসে উঠল । কমল কাঞ্চাকে খুব ভালোবাসে । কাঞ্চার যখন খুব মাথা ব্যাথা করে , কমল ওর মাথায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করে , “কিরে ? তোর কিছু মনে পড়ল ?” । কাঞ্চা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে , “সব অন্ধকার ! জমাট অন্ধকার..”

দুদিন বাদে ,পঞ্চা কাকা ,ওদের কলকাতায় যাবার অনুমতি দিল । ঝোলায় জিনিসপত্র ভরে ওরা বেরিয়ে পড়ল ,ট্রেন ধরে সোজা বালীগন্জে ,তারপর ফার্ন রোডের রাস্তায় ফেরি শুরু হল । সমুর বেশ ভাল লাগছিল ট্রেনে চড়ে কলকাতায় আসতে । জায়গাটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে, রাস্তাগুলোতে যেন কবে ও এসেছিল ! তারপর ফার্ন রোডের গলিতে ঢুকে সমুর যেন সব কেমন গুলিয়ে গেল । হঠাৎ, মাথায়

ভীষণ যন্ত্রনা ,চোখে অন্ধকার দেখল ও । কমল জিজ্ঞেস করল “কিরে ! শরীর খারাপ লাগছে ? আবার সেই যন্ত্রনা? চল ভাই, আজ বাড়ি ফিরি”।

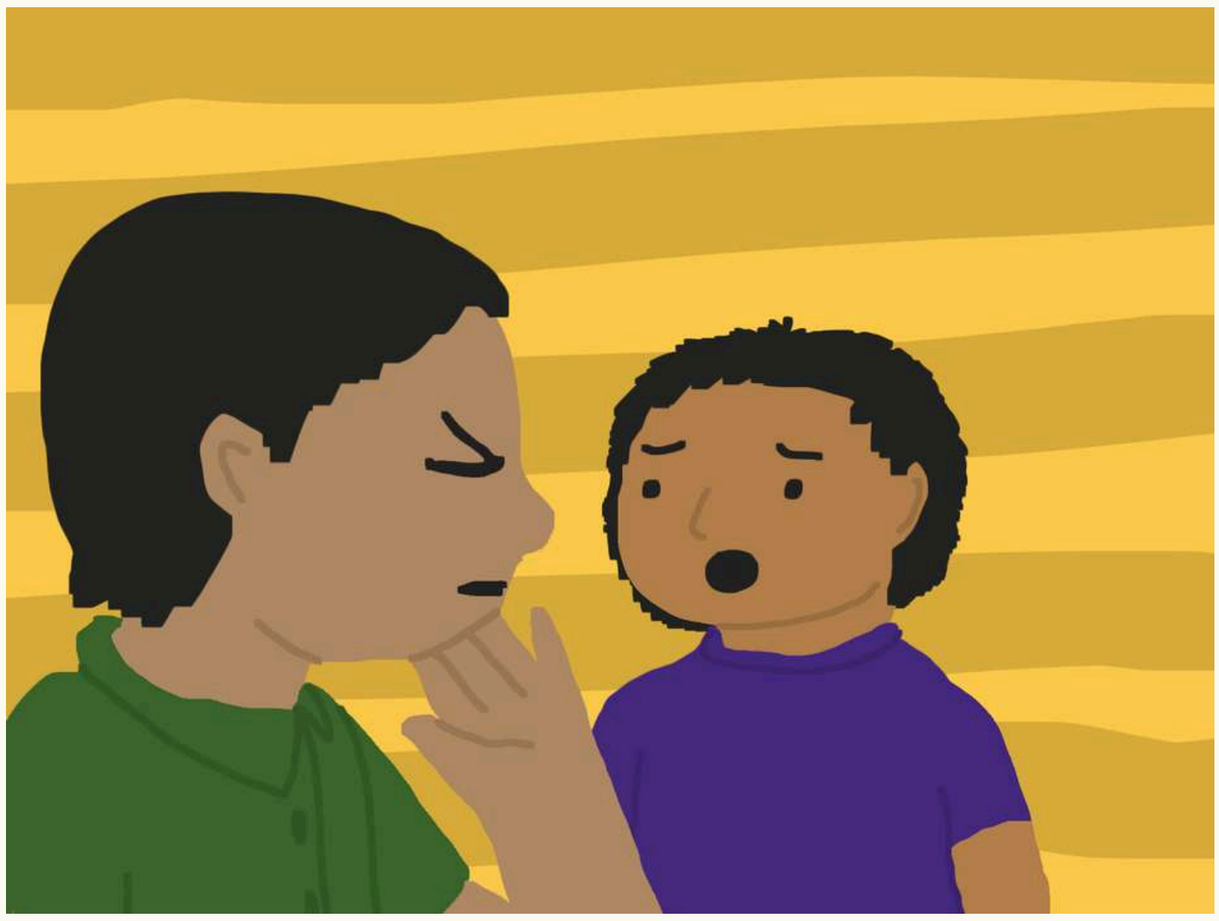

কালী মল্লিক লেনের ঘরে শুয়ে সমুর যেন কেমন আবছা আবছা মনে পড়ছে । একটা ছবি, এক দোতলা বাড়ি, সেখানে একজন মহিলা , একজন ছোট ছেলে । তারপর আবার সব অন্ধকার ।। কমল বলল “কিরে! কিছু মনে পড়ল ? তোরা কি কলকাতায় থাকতিস ?” সমুর কিছু মনে পড়ল না । ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে । কমল ভাবলো সমুর বাড়ি নিশ্চয়ই কলকাতায় ফার্ন রোডের কোথাও । পঞ্চা কাকা কে সে কিছু বলবেনা । কাল সে নিজে যাবে ওখানে খোঁজ নিতে, সমুর মতো ওখানে কেউ ছিল কিনা ।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ, ফার্ন রোডে গিয়ে খোঁজ নিয়ে, কমল বার করে ফেলল সেই ষোল/এ, নম্বর বাড়িটা । এটা সমুদের বাড়ি, ড্রইং-রুম, এ সমুর ছবি, সব ঠিক আছে । কমল রমলা ও সমীরণ কে নিয়ে সন্ধে বেলা পৌছল কালী
মল্লিক লেনে। সমু তখন খাটে শুয়ে , ওর জ্বর কিছুটা কমেছে। হঠাৎ রমলাকে চোখের সামনে দেখে , সমুর যেন সব পরিষ্কার মনে পড়ে গেল । মা এসেছে, পিছনে বাবা, আর তার ভয় নেই। এ কোথায় রয়েছে সে ? ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রমলার গলা । পিছনে দাড়িয়ে বিলু, রাজু, পঞ্চা কাকা । আজ সমু বাড়ি ফিরে যাবে । শুধু কমলকে কোথাও দেখতে পেলনা ও । পঞ্চা কাকার কাছথেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে সমুরা চলল বাড়ির দিকে ।

অন্ধকার গলির মুখে এসে দাঁড়াল একজন , তার চোখে জল কিন্তু মুখে হাসি । কমল দাড়িয়ে সমুদের গাড়িটাকে মিলিয়ে যেতে দেখল গলির মাথায় ।

--- এডিটর: ঈশানী দে

হলুদ পাখি - মায়ার অসময়ের বন্ধু, আর আমার এই গল্পটি লেখার অনুপ্রেরণা, যাকে আমি রোজ সকালে আমার ঘরের জানালার বাইরে কৃষ্ণচুড়া গাছে দেখতে পাই...

মায়ার বন্ধুরা
সৌমিলি সাধুখান, ৮-ঘ

ছটফটে, প্রাণবন্ত ছোট্ট মায়া তার দুষ্টুমি আর মিষ্টি কথায় সারা বাড়িকে মাতিয়ে রাখে। আর এইসবে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হলো রমা মাসির মেয়ে, দেবিকা। এক বড় দুর্ঘটনার পর, মায়া যখন তার চলার শক্তি হারিয়ে হুইলচেয়ারে বসল, সেই তখন থেকেই রমা মাসি আছে মায়ার দেখাশোনার দায়িত্বে।

গত এক মাস ধরে মায়া যেন বড্ড চুপচাপ। দেবিকাকে তার মা এবার স্কুলে ভর্তি করেছে। তার মতোই অনেক খুদে বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে সকাল হলেই সে স্কুলে চলে যায়। ফিরতে ফিরতে সেই দুপুর, তারপর সারা সন্ধ্যে ঘরে বসে হোমওয়ার্ক। তার এই ব্যাস্ত জীবনে মায়ার যেন কোন জায়গায়ই নেই। একা একা

নিজের সাথে সময় কাটাতে কাটাতে মায়া এবার ক্লান্ত। ধীরে ধীরে একাকীর্তের অন্ধকার মায়াকে গ্রাস করতে লাগল।

তাকে এখন প্রায়ই দেখা যায় চুপ করে বসে একদৃষ্টে জানালার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

এমনই একদিন সকাল। কৃষ্ণচূড়া গাছটি যেন লাল রঙের ফুলের চাদরে ঢাকা পড়েছে। হঠাৎ সেখান থেকে কে যেন মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল। মায়া দেখতে পেল, একটি হলুদ-কালো পাখি গাছের ডালে বসে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ডেকেই চলেছে। মায়া তাকে উদ্দেশ্য করে বলল,
“তুমি কে?”

হলুদ পাখি ঘাড় বেকিয়ে কথাটা শুনল। তারপর খানিক ভেবে যেন বলল,

"বেনেবউ... বেনেবউ।"

আর তারপরই সে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা শুরু করল আর মিষ্টি স্বরে মায়ার সাথে কত কথাই না বলতে লাগল। মায়ার বড় ভালো লেগে গেল পাখিটিকে। ধৈর্য ধরে পাখির সব কথা শুনে সে বলল,

"বেনেবউ, তুমি রোজ আসবে তো আমার সাথে গল্প করতে?"

ডানার সামান্য একটি ঝাপটা দিয়ে মনে হল পাখিটি যেন এই অনুরোধে সম্মতি দিয়েছে।

পরের দিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে মায়া তার হুইলচেয়ারটা নিয়ে জানালার ধারে চলে এল। একটু অপেক্ষার পরেই দেখা মিলল সেই হলুদ পাখির। আবার শুরু হলো তাদের অনন্য কথোপকথন।

মায়া এখন প্রতিদিন অপেক্ষা করত কখন তার খেচর বন্ধু এসে কৃষ্ণচূড়া গাছে বসবে। আর কখন মায়া তার সারাদিনের গল্প সাড়বে তার সাথে।

রোজ তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে মায়া নিজের অজান্তেই কখন পাখিদের ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ডালে ডালে নেচে গেয়ে বেনেবউও মায়ার একাকী মনকে আনন্দ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। এই ভাবেই এক অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠল মানব শিশু আরে পাখির মধ্যে।

গ্রীষ্মকালের সেই উষ্ণ, আর্দ্র দিনগুলি বেনেবৌয়ের উপস্তিথির দ্বারা মায়ার জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠল।তবে ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম শেষ হতে না হতেই কৃষ্ণচূড়ার প্রাণবন্ত পাতা ঝরে পড়তে লাগল।

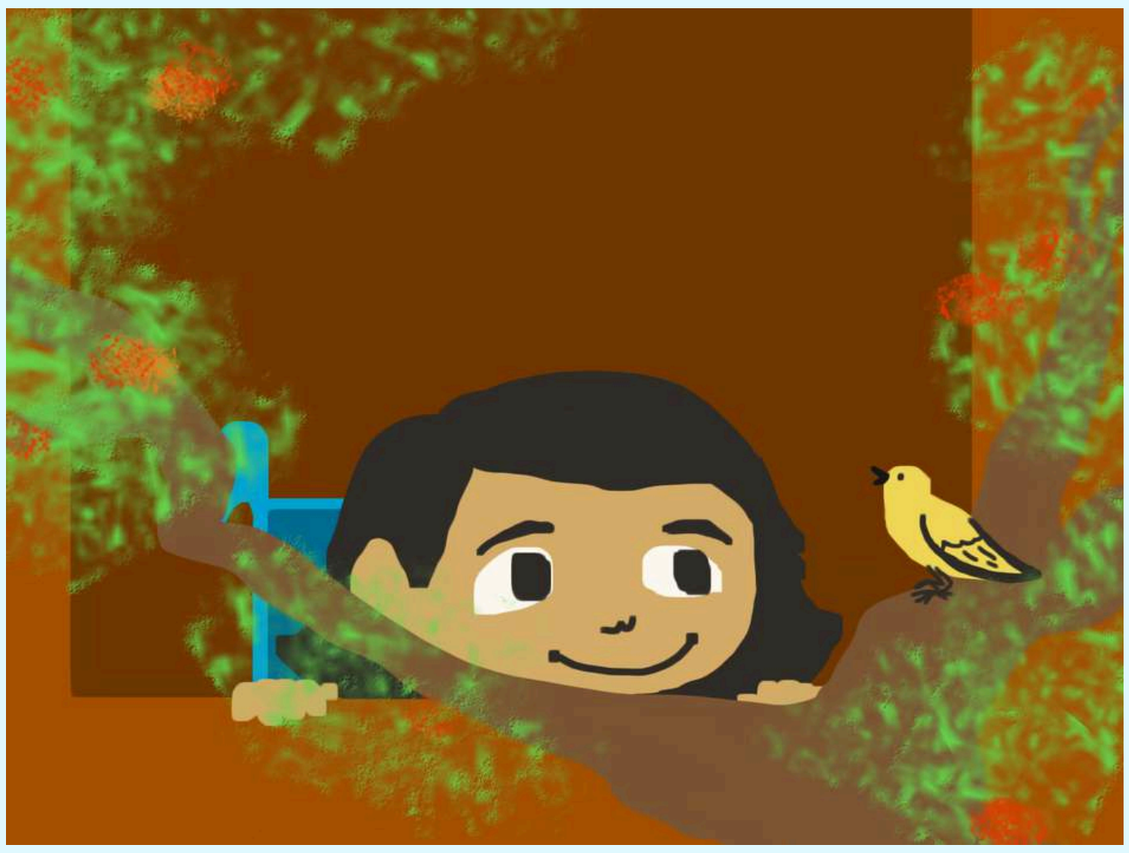

এমনকি বেনেবউও এই প্রখর পরিবর্তনটি উপলব্ধি করতে পারল ও মায়ার সাথে যোগাযোগ করার উৎসাহ খানিকটা হারিয়ে ফেলল।একদিন, মায়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিছু তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দে। সে দেখল কৃষ্ণচূড়া গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।চরম আতঙ্কে মায়ার মন ভরে গেল, এইটা ভেবে যে বেনেবৌয়ের ঘর ও তাদের বন্ধুত্ব দুটোই হয়তো চিরকালের মতো হারিয়ে গেল।

দুর্ভাগ্যবশত, তার ভয় সত্যি হল এবং বেনেবউ শীঘ্রই তার জীবন থেকে বিবর্ণ হয়ে গেল। মায়া বুঝতে পারল যে সে আরেকজন বন্ধুকেও হারিয়েছে।দিন হয়ে গেলো সপ্তাহে, সপ্তাহ হয়ে গেল মাস এবং বেনেবউ যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে পাঁচ বছরের মায়ার জীবনকে তার উজ্জ্বল হলুদ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আবার বাতাসে মিলিয়ে গেল।সেই পুরোনো একাকীর্ত ও জনশূন্যতা আরো একবার মায়াকে গ্রাস করে ফেলল।বেশ কয়েক মাস পেরিয়ে গেল । আজ সকালে রমা মাসি একা নয়, সঙ্গে এসেছে দেবিকাও।

হাতে এক ঝুড়ি পুতুল। দৌড়ে এসে মায়াকে জড়িয়ে ধরে সে বলল,

"স্কুলে আজ থেকে গরমের ছুটি শুরু। এই এক মাস সারাদিন তোর সাথেই কাটাবো।"
মায়া বুঝতে পারলো যে প্রকৃত বন্ধু কখনই ছেড়ে যায় না। এই ভাবেই এক ঝুড়ি ভালোবাসা আর হাসি নিয়ে সে বারে বারে ফিরে আসে। এক অনাবিল আনন্দে মায়ার মন ভরে উঠল। কিন্তু তার ছোট্ট মনের একটি কোণে যে সেই হলুদ পাখিও এতদিনে বাসা বেঁধে ফেলেছে।গ্রীষ্ম তো আবার এসেছিল। কিন্তু কোথায় সেই কৃষ্ণচূড়া গাছ, কোথায় মায়ের সেই প্রানপ্রিয় বেনেবউ? তাই দেবিকাকে পেয়েও বেনেবউকে ভুলতে পারে না মায়া। তার মন সর্বদা প্রশ্ন করে,

"ফিরবে না, সে কি ফিরবে না, ফিরবে না আর কোনদিন?"

এডিটার - আরশি রায় বিষ্ণু(৯-ক)

অকথন

ইহিনী প্রামাণিক ১১-গ

অনেকদিন তার সাথে হয়নি কথা।
তাও, আজ কিনা তার জন্মদিন,
তাই শেষবারটি দেখলাম প্রয়াস করে
ভুলেও কিংবা অন্যমনেও
একবার,
যদি ফোনটা ধরে।

এতদিনে নিশ্চই ভুলেছে অভিমান।
সবটা না ভুললেও কিছুটা,
ভুলে গিয়েছে, তার সেই কবেকার
ছেলেমানুষী রাগ।
যে খোলসে চিরকাল লুকিয়েছে
বালুচরের কাঁকড়ার মত,
তাতেও বুঝি দশ বছরে ফাটল
ধরেছে কিছু।

বুঝিনি,
দশটা বছর যে আসলে কিছুই নয়।

রিসিভারটা তুলে কানের কাছে ধরে
থাকি,
অনেকক্ষণ।

টেলিফোনের কালো তার তখনও
কথা কয় না কোনো,
কেউটের মত পেঁচিয়ে ধরে হাতের
আঙ্গুলগুলোকে,
আর অনেক রাত্রে ঝিঁঝিঁর মত, শুধু
শব্দ করে যায়।
বাতির আলোটা পিটপিট করে চেয়ে
থাকে চারিদিকে,
এত রাত বুঝি সেও জাগতে চায়নি।

বুকের কাছটা এবার মুচড়ে আসে
খানিক,
কপাল বেয়ে গড়িয়ে পরে চিবুকে
একটি বিন্দু ঘাম,
ঘণ্টার পিঠে ঘণ্টা ঘেঁষে, দিনের পর
দিন এসে,
চলে যায়।
কেটেছে কেবল একটি মিনিট।

জানি।
আকাশের গায়ে নীলের পরত সে।
অনেক করে হাত বাড়ালেও
তাকে ছুঁতে পারে না কিছুই,
কিছুই তাকে চিন্তায় করে না চঞ্চল।
শৈবালের মত সে তাই পালিয়ে
পালিয়ে বেড়ায়
এই পাঁচিল ছেড়ে ওই পাঁচিলে,
ওই পাঁচিল থেকে ফের অন্য
কোথাও।

তবু মনে পড়ে,
বর্ষাবিন্দু ঝঞ্ঝায় ভূপতিত হলেও
আবার তো বাদলেরই বুকে ফিরে
আসে একদিন।
তেমন সেও তো-
কিন্তু আশার হাতটা ছেড়ে দিলে,
তারপর?

তারপর দীর্ঘ দিশাহীন স্তব্ধতা
সাঁঝের মত নেমে আসে মাথার
উপর,
ঘরের চারিপাশ এক নিমেষে
মিলিয়ে গিয়ে হারিয়ে যায় তাতে।

তরল তমসা তখন নিশাচর
শিকারী পশু হয়ে
আঁকড়ে ধরে ঘাড়,
মাথা করে দেয় হেঁট।

ফোন সে তোলেনি এখনও,
তুলবে না বুঝি আর বছরেও,
রাগ করে আছে আজও,
এখনও।

কবে তার রাগ ভাঙবে জানিনে,
কোনোদিনও ভাঙবে কিনা, সেও
জানিনে।
তাই আজ আমার এত কথা,
নিরর্থক এই প্রলাপ,
শুধু জন্মদিনের শুভেচ্ছা ধরে
নিও।

আর, বছর ঘুরে ঠিক এই সময়ে
আবার দেখব ’ক্ষণে,
একবারটি প্রয়াস করে
ভুলেও কিংবা অন্যমনেও
একবার,
একবার যেন ফোনটা ধরে।

-এডিটর: সুমেধা সান্যাল

সম্পাদকীয়

“উচিত ছিল না”

দেবপর্ণা ঘোষ | ১০- ক

বোরখার আড়ালে শুধু জারা-র
চোখ দুটো যায় দেখা,
ক্লান্তিপূর্ণ দিনের শেষে, ফিরছে
বাড়ি একা।
তবে ব্যাপার এমন কি? এ তো
নিত্যদিনের নিয়ম,
মেট্রোতে করে বাড়ি ফেরে সে,
রাতের অন্ধকারে।

মানব ছদ্মবেশে যারা নিজেদের
পাশব পরিচয় আড়াল করে,
তাদের কুউদ্দেশ্যর নাগাল থেকে
আজ নিস্তার পাওয়া হলো না
সম্ভব ।
চলন্ত মেট্রোর দ্রুতগতির
আওয়াজে চাপা পড়ল তার
বেদনার আর্তনাদ,
চিহ্নিত হচ্ছিল তার শরীর ও
সম্মান,
নিশাচরদের নৃশংস আঘাতে।

যখন সে বাড়ি ফেরে,
সমাজ তাকে ‘কলঙ্কিত নারী’-র
উপাধিতে ভূষিত করে,
বলে, “এত রাত অবধি একলা
মেয়ের কাজ করা উচিত ছিল
না।”

ছোটবেলার থেকেই বীণা ফেরে
কারপুলে,
সবার শেষে আসে তার বাড়ির গলি,
তবে কারপুল কাকু ঠিক তাকে
গলির শেষে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দেয়,
দশ বছরে, বীণার কাছে অসম্ভব
ভরসার মানুষ তিনি।

তবে আজ কি হলো হঠাৎ?
গলির মধ্যিখানে গাড়ি থামলো -
“ও কাকু আরেকটু এগিয়ে তো,”-
বলতেই গায়ে কাঁটা দিলো তার,
সরীসৃপের মত, এক অস্বস্তিকর
সংবেদন আঁকড়ে ধরলো তাকে,
নয়নকোণে অশ্রুজল নিয়ে তাকাল
পূর্বপরিচিত মুখটি লাগলো অচেনা,
শয়তানসুলভ,
কম্পিত হাত দুটি জোড় হলো নিজে
থেকেই,
চাপা স্বরে বেরোলো, “না-।”
রক্তেভেজা স্কার্ট আর বেঁচে থাকার
অনিহা নিয়ে রাখলো মায়ের কোলে
মাথা,
নিজের প্রতি ঘৃণা আর অভাবনীয়
লজ্জা গ্রাস করছিল তাকে,
কিন্তু সমাজ শুধু বলল,
“ইউনিফর্মের স্কার্টটা এত ছোট
হওয়া উচিত ছিল না।”

“কি গো! শুনলে হাসপাতালের
ঘটনাটা?”
“হ্যাঁ, তা কি পরেছিল মেয়েটা
আগে দেখো সেটা,”
“কেনো, ডাক্তারের ল্যাবকোট।”
“অত রাতে––”
“নাইট ডিউটি ছিল।”
“কী করে তাহলে ––”
যে সমাজ তার ওপর হওয়া
অত্যাচারের দোষটাও তার ওপর
দিচ্ছে,
প্রাণ হারালো সে,
সেই সমাজেরই সেবা করতে গিয়ে।

এখন কোথায় সেই লোকগুলো?
বলবে না কি করা তার উচিত
ছিল না?
আমি বলছি, শোনো তবে।

আমাদের পরিধান যাই হোক,
নীচ নজরে তাকানো তাদের উচিত
ছিল না।
রাতের অন্ধকারে একা হওয়ার,
সুযোগ নেওয়া উচিত ছিল না।
তবে সর্বাপেক্ষা অনুচিত ছিল
আমাদের দুর্বল মনে করা,
নম্রতাকে, ভদ্রতাকে, দুর্বলতা
হিসেবে দেখা।

পদ্মাবতীর মত আজ অগ্নিকুন্ডে
ঝাঁপ দিতে ভয় নেই আমাদের,
রাস্তায় রাত দখল করছে আজ
দেবীদের প্রতিরূপ।
শয়তানরা, সময় দিলাম যাও
যেখানে যাওয়ার,
সম্মান কেড়েছো, আর কিন্তু
আমাদের নেই কিচ্ছু হারাবার।
শত নারীর অশ্রুজলে,
কেবলমাত্র প্রতিবাদ নয়, বিদ্রোহের
অগ্নিশিখা জ্বলে,
বাঁচাতে অক্ষম হবেন তোমায়
যমরাজ স্বয়ং,
নারী জাগরণেই হবে আজ অসুরের
দমন।

Credits-

Illustrated by - Jiya Haldar XI-A

Edited by- Ayesha Ali XI-D

WRITERS AND POETS-

শ্রেয়সী মল্লিক, শ্রেণি: ১২ বিভাগ- 'গ'

ভার্গবী দাস । ষষ্ঠ শ্রেণী, ঘ বিভাগ।

শিবরঞ্জনী মিত্র।(ক্লাস-৬-ঘ)

সৌমিলি সাধুখান, ৮-ঘ

দেবপর্ণা ঘোষ | ১০- ক

ইহিনী প্রামাণিক ১১-গ

(লেখাগুলি একত্রিত করে এডিট করেছে: ঊর্জা ঘোষ - নবম শ্রেণি, খ বিভাগ)